পথে এবার নামো সাথী

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

দ্বিতীয় প্রবাস -২৬

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

ত্রিশ অক্টোবর বিকেলে আমরা আবার আমাদের নিউ ব্রানসউইকের বাসা Treetop Apartments এ ফিরে এলাম। শিরিন আর তার পরিবার সঙ্গে থাকায় শুন্য ঘরে ফেরার বেদনা সহ্য করতে হলোনা। তারেক আর মাহারীন গেল আমাদের ভাড়া করা SUV ফেরৎ দিতে। সেদিন সকালে আমরা দেরী করে নাস্তা সেরে পথে নেমেছিলাম বলে দুপুরের খাবার খাওয়া হয়নি। কিন্তু সাড়ে তিন ঘন্টা গাড়ীতে বসে থেকে সবারই বেশ ক্ষিধে পেয়ে গেছে। বাসায় পৌঁছেই নাসিম রান্নার কাজে লেগে গেল এবং চটজলদি নুডলস জাতীয় কিছু খাবার রান্না করে ফেলল। তারিক আর মাহারীন ফিরে এলে আমরা সবাই মিলে সেই নুডলস খেলাম। খেতে খেতে ঠিক করা হলো রাতের খাবার নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের বাংগালী পাড়ায় গিয়ে খাওয়া হবে। মুসাওয়ির নাকি বহুদিন ওখানে যায়নি। আমি অবশ্য যেতে ইতস্ততঃ করছিলাম; আজকে বিকেলে আমি যে বিষয়টি পড়াই তার মিড-টার্ম পরীক্ষা। ভয় ছিল আমি না থাকলে আবার কোন অসুবিধা হয় কিনা। অফিসে ফোন করতেই জানালো কোন অসুবিধা নেই; দরকার হলে ওরা আমার সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করবে। আমরা পাঁচটার মধ্যেই বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম এবং স্বাভাবিক কারণেই afternoon peak এর ভীড়ের সন্মুখীন হলাম। তবে দলেবলে গল্প করতে করতে চলতে পারায় ভীড় নিয়ে কারো তেমন কোন অভিযোগ থাকলো না।

সারা সন্ধ্যে বেলাটা জ্যাকসন হাইটসে ঘুরে ফিরে কাটিয়ে, খেয়ে, বাজার করে আমরা যখন বাসায় ফিরে এলাম তখন রাত প্রায় দশটা বাজে। কালই মুসাওয়ীর এবং শিরিনের কাজে যোগ দিতে হবে। আজ রাতটা ওরা ওদের মেয়ে মাহারীনের বাসায় থেকে পরদিন খুব ভোরে মেরীল্যান্ড রওয়ানা হয়ে যাবে। এ যাত্রায় ওদের সাথে আমাদের আবার দেখা হওয়ার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব দু'বোনের বিদায় বেশ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে থাকলো। বহু বৎসর পর সবাই মিলে ক'টা দিন আনন্দে কাটানোর সুখস্মৃতির রেশ কাটতে না কাটতেই 'বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ'। 'হে প্রিয় আমার যাত্রা পথ, অশ্রু পিছল করোনা আর' মনে রেখেও এক বোন আরেক বোনকে সজল চোখেই বিদায় জানালো। হঠাৎ করেই আমাদের ছোট বাসাটি নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল। নাসিম ব্যস্ত হয়ে গেল ঘর গোছানোর কাজে আর আমি লেগে গেলাম আমার ল্যাপটপ নিয়ে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ। বেশ গভীর রাতে পরিবারবর্গ সহ এহসান এবং রাশেদ ফিরে এলো। ওরা মিডলটাউন থেকে ঝটিকা সফরে বস্টন গিয়েছিল। ওরা আসায় বাসাটা আবার যেন হেসে উঠলো; কিন্তু সে হাসি খুবই স্বল্পস্থায়ী কেননা এহসানরা কাল ভোরেই টরন্টো চলে যাবে। রাশেদরা অবশ্য আরো দু'এক দিন এখানে কাটিয়ে ইংল্যান্ডে ওদের ঠিকানায় ফিরে যাবে।

নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরদিন সকালের নাস্তা সেরে এহসান তার বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে চলে গেলো। ওরা চলে যাবার পর আমরা রাশেদদেরকে নিয়ে বাসার কাছে রাটগারস ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ক্যাম্পাস ঘুরে ফিরে বেড়ালাম এবং দুপুরের খাবার সেরে বাসায় ফিরে এলাম। আজ আর অন্য কোন কাজ নয়, শুধু বিশ্রাম। পরদিন আমরা সদলবলে গেলাম Princeton University দেখতে। ট্রেনে নিউ ব্রানসউইক স্টেশন থেকে প্রিন্সটন স্টেশন যেতে পয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের মতো সময় লাগে। প্রিন্সটন স্টেশন থেকে সাটল ট্রেন নিয়ে Princeton University Campus এ যেতে হয়। প্রতি দশ মিনিট অন্তর এই সাটল ট্রেন চলাচল করে এবং এতে সময় লাগে প্রায় দশ বারো মিনিট।

ঐতিহ্যের দিক থেকে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকার প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকারী। আর শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে এটি আমেরিকার আটটি আইভী লীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রথমে 'কলেজ অফ নিউজার্সি' নামে নিউ ব্রানসউইকের উপকণ্ঠে 'এলিজাবেথ' শহরে স্থাপিত হয়েছিল। দশ বছর পরে একই নামে মহাবিদ্যায়তনটি প্রিন্সটনে স্থানান্তরিত হয়। এর প্রায় একশত চল্লিশ বৎসর পর, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম পরিবর্তন করে 'প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়' রাখা হয়। যদিও প্রাথমিক অবস্থায় প্রিন্সটন আন্ডারগ্রাজুয়েট শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করতো, বর্তমানে সে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে গ্রাজুয়েট শিক্ষার ব্যাপারেও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় এখন আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয় গুলির মধ্যে একটি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে প্রায় ষাট লক্ষাধিক বই রয়েছে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অধিকাংশই কোন না কোন ধর্মীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত। উল্লেখযোগ্য যে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলায় তা মোটেও সত্যি নয়।

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য এক কথায় নয়নাভিরাম। এর বিভিন্ন ভবনের স্থাপত্যশৈলী, সাজানো গোছানো বাগান, বিশাল খেলার মাঠ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভাস্কর্যের সৌন্দর্য খুব সহজেই দর্শককে আনন্দ দেয়। আমরা হেটে হেটে ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান যেমন ক্লীভল্যান্ড টাওয়ার, নাসাউ হল, ম্যাককার্টার থিয়েটার, ফাইন হল, ক্লিও হল, ইষ্ট পাইন কোর্টিয়ার্ড এবং বিভিন্ন ভাস্কর্য দেখে কাটলাম। রাশেদ এবং তাতনের দুই মেয়ে রুশদা আর রুয়াইদা তার আগের দিনই হারভার্ড এবং ইয়েল ইউনিভার্সিটি দেখে এসেছে। 'এটাই বেশী সুন্দর' বলে ওরা ওদের সুচিন্তিত মতামত জাহির করলো। দুপুরের শেষভাগে আমরা ইউনিভার্সিটি সংলগ্ন শপিং এলাকায় খাবার দাবার সারলাম। তারপর দু'চারটা স্যুভেনির কিনে পাঁচটার দিকে বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ান হলাম।

পরদিন, দোসরা নভেম্বর, তাতনের এক বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধুর বর এসে ওদেরেকে নিউইয়র্কে নিয়ে গেল। আগামি তিনদিন ওরা নিউইয়র্কের বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গা দেখে চার তারিখ লন্ডন রওয়ানা হয়ে যাবে। ওরা আর আমাদের Treetop Apartments এর বাসায় ফিরে আসবেনা। আবার ভাইবোনের বিচ্ছেদ, আবার বিদায়ের পালা। কিন্তু এটাই তো শেষ নয়; পরদিন নাসরীন এবং কাজলের নিমন্ত্রনে নিউইয়র্কের এক চায়নীজ রেস্টুরেন্টে ডিনারে যেতে হোল। সেখানে আবার বিদায়ের আরেক অংক। যাই হোক, সেটাও যথা বিহিত শেষ হলো। আমরা আবার আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলাম।

আমার ভাগ্নী পুনম ও তার স্বামী তমাল জোয়ার্দার ডালাস থাকে। গত বছর আগষ্ট মাসে ঢাকায় ওদের বিয়ে হবার কিছুদিন পরই তমাল ডালাস চলে আসে। ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা শেষ করে পুনমের আসতে বেশ কিছুদিন সময় লেগে যায়। তমালের বাবা জনাব রুহুল কুদ্দুস সাহেবও সপরিবারে ডালাসেই থাকেন। তিনি তার নববিবাহিত পুত্র এবং পুত্রবধুর সন্মানে অনেকদিন থেকেই ডালাসে একটা বিবাহোত্তর সম্বর্ধনা পার্টি দেবার কথা ভাবছিলেন। শেরিফের বিয়েতে আমরা আমেরিকা আসবো জেনে তিনি দশই নভেম্বর সেই পার্টির দিন ঠিক করেছেন। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য আমরা সাতই নভেম্বর সকাল বেলায় বাসা থেকে বের হলাম। এই যাত্রায় আমাদেরকে বেশ ভুগতে হলো। নিউইয়র্কের লাগোয়ারডিয়া এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের ফ্লাইট নেবার

কথা বেলা একটায়। কিন্তু সকালে এমনই তুমুল বৃষ্টি শুরু হলো যে বাসা থেকে বেরিয়ে ট্রেন স্টেশনে যাবার কোন উপায় থাকলো না। নিউ ব্রানস উইক ছোট শহর, এখানে ট্যাক্সি আছে তবে সংখ্যায় খুবই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের সময় তাদেরকে পাওয়া যায়না। ঐ যে কথায় বলে অগত্যা মধুসূদন; উপায়ান্তর না দেখে বন্ধু মাহমুদ হাসানকে ডাকলাম। এই ভরা বর্ষায় প্রচন্ড যানজটের মধ্যে প্রায় আট-দশ মাইল উজানে গাড়ী চালিয়ে এসে উনি আমাদেরকে নিউ ব্রানস উইক ট্রেন স্টেশনে পৌছে দেয়ায় কোনমতে ট্রেন ধরা গেল। তবে নিউইয়র্কে এসে সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে বের হয়ে এয়ারপোর্টে যাবার জন্য ট্যাক্সি ধরতে গিয়ে আমাদেরকে বেশ ভিজতে হলো। যাই হোক, ভিজে কাপড় গায়ে শুকিয়ে আমরা সন্ধ্যে বেলায় ডালাস এসে পৌঁছলাম। পুনমের মা, অর্থাৎ আমার বোন ফরিদা আগেই এসে গেছে। পুনমের ভাই ও ভাবী পরাগ এবং ডোনা এলো পরদিন সকালে। ডালাসে আমার চাচাতো ভাই টিপু এবং তার বৌ রুনাও থাকে। ফলে এখানে এসে ভাই, বেয়াই আর ভাগ্নীর বাড়ীতে খেয়ে দেয়ে আমাদের বেশ ব্যস্ত সময় কাটলো। পুনম ও তমালের সম্বর্ধনার অনুষ্ঠানটি ছিল বেশ সুন্দর এবং ছিমছাম; আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে পুনম এবং তমাল বেশ ক'টি গান গেয়ে সমবেত অতিথিদেরকে আপ্যায়িত করলো।

ডালাস অনেক কারণেই খ্যাত। তবে এর কুখ্যাতিটাই বেশী। ১৯৬৩ সালের ২২ শে নভেম্বর ডাউনটাউন ডালাসের ঐতিহাসিক ওয়েষ্ট এন্ড এলাকার ডিলি প্লাজায় লী হার্ভে অসওয়ালড নামক এক আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান আমেরিকার সর্বকালের অন্যতম জননন্দিত প্রেসিডেন্ট জন ফিটজেরালড কেনেডী। ডিলি প্লাজা ডালাসের মেইন স্ট্রিট, এলম স্ট্রিট এবং কমার্স স্ট্রিটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। কেনেডী হত্যাকান্ডের সাড়ে চার দশক পরও প্রতিদিন দেশ বিদেশের বহু লোক এখানে এসে প্রেসিডেন্ট কেনেডির বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। ১৯৯৩ সালে আমেরিকার ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস ডিলি প্লাজাকে National Historic Landmark হিসেবে চিহ্নিত করে। ২০০৩ সালের শেষ দিকে ডালাস মহানগরীর কর্মকর্তারা ডিলি প্লাজাকে তার প্রাক ২২ নভেম্বর, ১৯৬৩ র অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

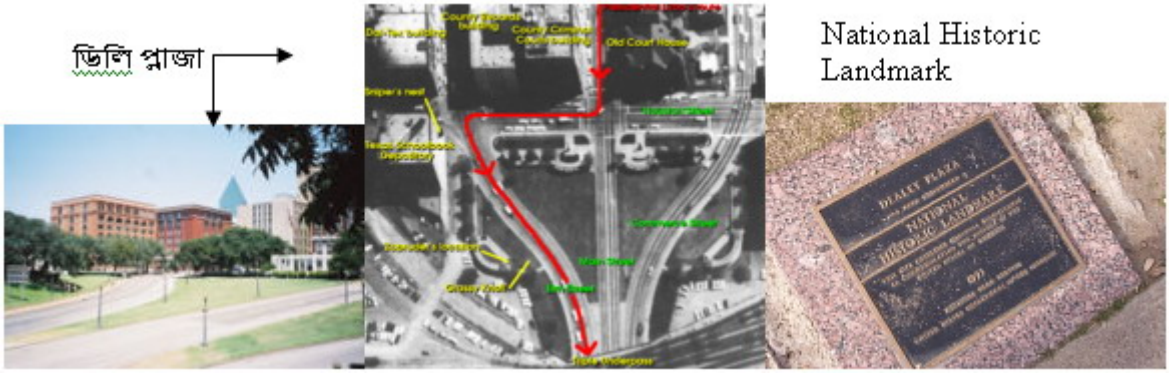

ডালাস রওয়ানা হবার আগেই আমার শৈশবের বন্ধু ইফতিখার চৌধুরীর সাথে কথা হয়েছিল যে ও ১১ তারিখ আমার সাথে দেখা করতে আসবে। সেই কথামত একমাত্র ছেলে তামিমকে নিয়ে ও আমার সাথে দেখা করতে পুনমের বাসায় এলো। এই ইফতিখারের বোন বুলন্দের সাহায্যের কথাই আগে বহুবার উল্লেখ করেছি। ইফতিখার টেক্সাস এ এন্ড এম কলেজে কনস্ট্রাকসন ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের অধ্যাপক। থাকে কলেজ স্টেশন নামে ছোট ইউনিভার্সিটি শহরে। এই শহর থেকে গাড়ী চালিয়ে ডালাস যেতে এবং সেখান থেকে ফেরৎ আসতে প্রায় সাড়ে সাত ঘন্টার মত সময় লাগে। কিন্তু তবু ইফতিখার এসেছে। খুবই ভালো লাগলো ওকে দেখে। আমরা ক্লাশ ফাইভ থেকে বন্ধু; দু'জনেই নারায়ণগঞ্জ হাই স্কুলের ছাত্র ছিলাম। যতদুর মনে করতে পারি ক্লাশ এইটে পড়ার সময় ইফতিখারের আব্বা বদলী হয়ে কুমিল্লা চলে যান। ঢাকা কলেজে আমাদের আবার দেখা হয়। ওর আব্বা ততদিনে আবার বদলী হয়ে নারায়ণগঞ্জে চলে

এসেছেন। কলেজ শেষ করে আমরা দু'জনেই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হই। ইফতিখার ছিল স্থাপত্য বিভাগের ছাত্র আর আমি ধাতবকৌশল বিভাগের। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোটা জীবন আমরা কায়েদে আজম হলের ৩০৭ নম্বর রুমে কাটিয়েছি। ওর সাথে সম্ভবতঃ আমার শেষ দেখা হয়েছিল প্রায় আট বছর আগে। আমি তখন সিংগাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়াই। একটা কনফারেনসে সিংগাপুরে এসে ইফতিখার আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল এবং আমার বাসায় এসে ঘন্টা দুয়েক সময় ছিল। এই দীর্ঘ দিন আর আমাদের কোন যোগাযোগ ছিলনা। আজ একে অন্যকে দেখে অনেক ক্ষণ ধরে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সিলেটের ছেলে ইফতিখার ছিল আমাদের সমসাময়িক বন্ধুদের মধ্যে ঈর্ষণীয় ধরণের সুদর্শন এবং সদাহাস্যময়। আজো তার মুখে হাসি লেগে আছে, আজো সে সুদর্শন, কিন্তু বয়স কেড়ে নিয়েছে তার যৌবনের জৌলুষ। তামিমকে আমি আগে দেখিনি, তবে যতবারই ওর দিকে চোখ গেল ওর মাঝে আমি যেন প্রথম যৌবনের ইফতিখারকেই দেখতে পেলাম।

পুনম ওর বাসায়ই দুপুরের খাবার খেতে বলেছিল, কিন্তু আমি তাতে রাজী হলাম না। আমি, ইফতিখার আর তামিম মিলে একটা ভারতীয় রেষ্টুরেন্টে খেতে গেলাম। ওখানে বসে গল্প শুরু করতেই পুরোনা দিনের স্মৃতির ঝাঁপি যেন খুলে গেল। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কত ঘটনা, কাহিনী, জীবনের সুখ দুঃখ, আনন্দ, বেদনার খন্ডচিত্র চোখের সামনে চলে এলো। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই যে আমাদের পুরোনো দিনের অনেক কথাই তামিমের জানা। 'তুমি এত সব কেমন করে জানো' তামিমকে প্রশ্ন করলাম। 'আব্বা আপনার কথা অনেক মনে করে - he remembers you a lot', তামিমের জবাব। তামিমকে বলা হলো না আমিও তার বাবাকে খুবই মনে করি; বন্ধু শব্দটির সাথে আমার যতদিনের পরিচয়, তার বাবার সাথেও আমার পরিচয় ততদিনের। বিকেল চারটার দিকে আমরা বাসায় ফিরে এলাম। আবার গল্প জমলো। এবার অবশ্য মধ্যমনি তামিম। তামিমের ব্যবহারে আমাদের বাসার সবাই মুগ্ধ। অল্প সময়ের মধ্যেই ও সকলকে যেন আপন করে নিল। কিন্তু ওদেরতো দীর্ঘ পথ যেতে হবে। বাসার সবার সাথে চা-নাস্তা খেয়ে তামিম এবং ইফতিখার বিদায় নিলো।

পরদিন ডালাসের বাংগালীদের ঈদ পূনর্মিলনী উৎসব। ডালাসের হোটেলের ফাংশন রুমে অনুষ্ঠিতব্য এই পূনর্মিলনীর নৈশভোজে যোগ দেবার জন্য আমরা এই শহরে পৌঁছার অনেক আগেই তমাল আমাদের সবার জন্য টিকিট কিনে রেখেছে। সন্ধ্যে বেলায় উৎসবের ভেনুতে পৌঁছে দেখি এলাহী কারবার; মনে হোল প্রায় হাজারখানেক লোক সেখানে জমায়েৎ হয়েছে। বিশিষ্ট অতিথির মধ্যে সেখানে আছেন স্বনামখ্যাত সংগীত শিল্পী ফেরদৌসী রহমান; তিনি সেখানে তার ছেলে বা মেয়ের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছেন। তার গলা খারাপ থাকায় তিনি গান গাইলেন না তবে খুব সুন্দর, প্রবাসীদের হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া কিছু কথা বললেন । অনুষ্ঠানে ভাল মন্দ মিশিয়ে গান-নাচ-বক্তৃতা সবই হোল; তবে রাতের খাবারটাকে আমরা কোন বিচারেই ভালোর সার্টিফিকেট দিতে পারলাম না; সত্যিকার অর্থেই সেটা ছিল অখাদ্য। আমরা বাসায় এসে আবার খেলাম।

পরদিন খুব ভোরে আমাদের ফ্লাইট; তাই তাড়াতাড়িই শুয়ে পরলাম। সকালে উঠে সামান্য চা-নাস্তা খেয়ে আমরা ডালাস এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমাদের গন্তব্য নিউইয়র্কের আবহাওয়া খারাপ থাকায় আমাদের ফ্লাইট ছাড়তে দেরী হলো। ঘন্টা খানেক পর রওয়ানা হয়ে আমরা যখন নিউইয়র্কে এসে পৌঁছলাম, তখন বৃষ্টি ধরে এসেছে। বাসায় এসে পৌঁছতে রাত প্রায় দশটা বেজে গেলো।

আমাদের বাসা এবার সত্যিকার অর্থেই শুন্য। বিয়ের উৎসব শেষ; দূর দূরান্ত থেকে আসা আত্মীয় স্বজনরা যে যার ঠিকানায় চলে গেছেন। আমার ক্ষেত্রে যদিও পড়ানো এবং গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কমবেশী সুযোগ রয়েছে, নাসিমের হয়েছে মুশকিল। ওর তেমন কিছু করার নেই। বুলন্দ মাঝে সাঝে ওকে এখানে ওখানে নিয়ে যায়, তবে তাতে কি আর অখন্ড অবসর কাটে? তাই আমরা ঠিক করলাম যে প্রতি সোমবার

আমার ক্লাশ সেরে মঙ্গল বা বুধবার আমরা আমেরিকার বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আত্মীয় স্বজন কিংবা বন্ধু বান্ধবদের ওখানে বেড়াতে যাব আর রোববারের মধ্যে নিউ ব্রানস উইকে ফিরে আসবো। আমেরিকার ভিতরে আন্তঃনগর ভ্রমনের জন্য বিমান ভাড়া খুব সস্তা। এ ছাড়া রয়েছে দুর-পাল্লার ট্রেন, কিংবা গ্রে-হাউন্ড এবং অন্যান্য অনেক আন্তঃনগর বাস সার্ভিস। আমরা প্রতি বৎসরই অন্ততঃ একবার আমেরিকায় আসি। কিন্তু সে আসা খুব অল্প সময়ের জন্য; হয় কনফারেনসে পেপার পড়ার জন্য, নয়তো বা মেয়ে-জামাই, নাতি, নাত্নীকে দেখার জন্য। অন্য আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের সাথে দেখা করার সময় বা সুযোগ কোনটাই হয়ে ওঠেনা। এবার যখন সে সুযোগ পাওয়া গেছে, অবশ্যই তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। আর আমরা করলাম ও তাই; বেশ কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করে আগামী সপ্তাহ গুলিতে বিভিন্ন জায়গায় বেড়ানোর ব্যবস্থা পাকা করে ফেললাম। এই পরিকল্পনায় আমাদের প্রথম গন্তব্য শেরিফ-সাবাহর নতুন সংসার, বস্টন।

শেরিফের ছুটি শেষ হয়ে যাচ্ছে, ওকে সিডনী ফেরৎ যেতে হবে। আপাততঃ সাবাহকে রেখেই ও যাচ্ছে। আমরা ঠিক করলাম শেরিফ-সাবাহর নতুন সংসার দেখার জন্য আমাদের সেখানে যাওয়া উচিৎ। আঠারোই নভেম্বর শনিবার দুপুর বেলা আমরা নিউইয়র্কের চায়নাটাউন থেকে ফু-ওয়াং কোম্পানীর বাস নিয়ে বস্টন রওয়ানা হলাম। এই বাসগুলো গ্রে-হাউন্ড বাসের মত আরামদায়ক নয়, তবে এদের ভাড়া খুবই কম। যেখানে নিউইয়র্ক থেকে বস্টন যেতে গ্রে-হাউন্ড বাস নেয় ৪০ ডলার, সেখানে এই চাইনিজ বাসগুলোর ভাড়া মাত্র পনেরো ডলার। পথে কানেটিকাটের ওয়েস্ট হার্টফোর্ড শহরে পনেরো মিনিট থেমে আমরা পৌনে চার ঘন্টার মধ্যে বস্টন এসে পৌঁছলাম। সাবাহ আর শেরিফ এসে আমাদেরকে বস্টনের আন্তঃনগর বাস স্টান্ড থেকে তুলে নিয়ে গেল। ওদের বাসা চেস্টনাট হিল নামে বস্টনের এক সাবার্বে। যদিও বাস স্ট্যান্ড থেকে ওদের বাসা মাত্র সাত আট মাইল দুর, শহরে বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কাজ হবার কারণে এই পথটুকু যেতেই বেশ সময় লেগে গেল। তবে তাতে আমাদের লাভই হলো; আমরা আমেরিকার শিক্ষানগরী বস্টনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যেমন, হার্ভার্ড, নর্থওয়েস্টার্ন, টাফট ইত্যাদি দেখতে দেখতে গেলাম।

শেরিফ-সাবাহর বাসায় পৌছে নাসিমের কি অনুভুতি হলো তা আমি জানি না, তবে আমার প্রথম অনুভুতিটা বোঝানো খুব সহজ নয়। একসঙ্গে কৌতুহল, আনন্দ এবং অস্বস্তির মিশ্রণে যে ভাব হয় সেটাকে ভাষায় বর্ণনা করা বেশ কঠিনই বটে। আমি কি এদের পরিবারের অংশ না কি এদের অতিথি? যে বন্ধনে পিতা-পুত্র বাঁধা থাকে, যে বন্ধনে আমি আর আমার আত্মজ শেরিফ এতদিন বাঁধা ছিলাম, সে বন্ধন কি এখনো আগের মতোই সুদৃঢ় আছে না কি অন্য কোন দৃঢ়তর ভালোবাসার বন্ধন তাকে দুর্বল করে দিয়েছে? ১৯৯৫ সালে ফ্লোরিডার টাল্লাহাসি শহরে আমাদের নববিবাহিতা মেয়ে সোনিয়া আর জামাই নোমানের সংসারে প্রথমবারের মতো বেড়াতে এসে এমন হয়েছে বলে তো মনে পরেনা। আনন্দ আর কৌতুহল অবশ্যই ছিল; কিন্তু কোন ধরণের অস্বস্তি ছিল বলে তো মনে করতে পারছি না। ছেলে আর মেয়ের সংসারে প্রথম বেড়ানোর অনুভুতি কি ভিন্ন? কেন এই বিভিন্নতা? সে কি এজন্য যে আমাদের সংস্কৃতিতে আমরা ধরেই নেই মেয়ে অন্যের আমানত, আর ছেলে হলো নিজের সম্পদ? সে বিভিন্নতার কারণ কি এই যে মেয়েকে একদিন পরের ঘরে চলে যেতেই হবে আর বংশের বাতি ছেলের মাঝেই আমরা জন্ম-জন্মান্তর বেঁচে থাকবো? নাকি আমার অস্বস্তি এ জন্য যে আমার পুত্রবধু ভিন্ন সাংস্কৃতিক বলয়ে মানুষ? এর উত্তর আমার জানা নেই; তবে জানতে ইচ্ছে করে সব বাবার অনুভুতি কি আমারই মতো বিমিশ্র কিনা।

শ্বশুর শ্বাশুরীর জন্য সাবাহ আজ তার নিজের হাতে গুজরাটি খাবার রেঁধেছে। মেনু বেশ লোভনীয়; খিচুরী, বেগুন ভাজা, মাংস এবং আরো অনেক কিছু। শেরিফ সালাদ বানিয়ে সাবাহকে সাহায্য করছে। দেখে খুব ভালো লাগলো; নিজের অজান্তেই মন চলে গেল প্রায় চার দশক আগের আমার আর নাসিমের সংসার জীবনের শুরুতে। চোখের সামনে

ভেসে উঠলো ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় ব্লুমিংটন ক্যাম্পাসের ছোট এফিসিয়েন্সি এপার্টমেন্টে ২৩ বছর বয়সী বর আমি আর ১৯ বছর বয়সী বধু নাসিমের প্রথম সংসার। দুই অপরিণত বয়সের স্বামী-স্ত্রীর সে সংসারে প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি, রাগ-অভিমান ছিল; তবে আনন্দ ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। আমাদের তুলনায় আমাদের পুত্র এবং পুত্রবধু দুজনেই বেশী পরিণত; আমরা অনুন্নত দেশে কষ্ট করে বড় হয়েছি, আর তারা শৈশব থেকেই উন্নত দেশের উন্নত পরিবেশে মানুষ হয়েছে। তাদের জীবন যাপনের ধারা, চিন্তা-চেতনা সবই তো আমাদের চেয়ে ভিন্ন। সেই ভিন্নতা যেন অমংগল নয় মংগল বয়ে আনে ওদের জীবনে। অন্তরের অন্তস্থল থেকে প্রার্থনা চলে এল 'হে পরম করুনাময়, ওদেরকে তুমি ভালো রেখো, ওদের জীবন তুমি সুখময়, শান্তিময় করে তোল।'

বস্টনে আমরা এক রাতই ছিলাম; নব দম্পতির সংসারে 'কাবাব মে হাড্ডি' হতে চাইনি। দু'দিন পরেই শেরিফ সিডনীতে চলে যাচ্ছে, ও সাবাহর সাথে যত বেশী সময় কাটাতে পারে ততই ভাল। আমার আর নাসিমের বিয়ের মাত্র দশ দিন পর আমিও নাসিমকে রেখে একা আমেরিকা চলে এসেছিলাম; অবশ্যই সে বিরহ বড়ই হৃদয় বিদারক ছিল। চার মাস পর নাসিম আমার সাথে যোগ দিয়েছিল। কি আশ্চর্য, history repeats itself; ছেলের জীবনেও বাপের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে। বিয়ের তিন সপ্তাহ পর সাবাহকে একা রেখে শেরিফকেও চলে যেতে হচ্ছে। তবে কয়েক মাস পর ইনশা'ল্লাহ তারা আবার একে অন্যের সাথে মিলিত হবে।

(চলবে)

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)